রামনিকু ভেলসিয়া সাইবারক্রাইমের বিশ্বরাজধানী

গোলাপ মুনীর

রামনিকু ভেলসিয়া। অন্য নাম রিমনিকু ভেলসিয়া। রুমানিয়ার প্রত্যন্ত এলাকার এক ছোট্ট শহর। সুপ্রিয় পাঠক, আন্দাজ করি শহরটির নাম এই প্রথম জানলেন। মনে হয় এর আগে কখনোই এ শহরের নাম শুনেননি। কিন্তু এরই মধ্যে সাইবারক্রাইম এই শহরকে দিয়েছে অন্য ধরনের পরিচিতি : 'সাইবারক্রাইমের বিশ্বরাজধানী– দ্য ওয়ার্ল্ড ক্যাপিটাল অব সাইবারক্রাইম'। বলা যায়, সাইবারক্রাইমই গড়ে তুলেছে এই শহর। বলা হচ্ছে রুমানিয়ার এই শহরটি এখন 'এপিসেন্টার অব ডিজিটাল স্ক্যাম- ডিজিটাল কেলেঙ্কারির নাভিকেন্দ্র'। সাইবারক্রাইমের বিশ্বরাজধানী শহর এই রামনিকু ভেলসিয়ার কথাই জানাবার প্রয়াস পাব এ লেখায়।

রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট। সেখান থেকে ৭ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে তিন ঘণ্টার পথ। এই পথ পাড়ি দেয়ার পর আপনি পাবেন মসৃণ চালু এক পাহাড়ি পথ চলে গেছে ট্রান্সসালভানিয়ান আল্পসের পাহাড়ের পাদদেশে। পশুচারণের তৃণভূমির ওপর দিয়ে চলে যাওয়া পথ। এ পথে চলতে চলতে দেখা যাবে ভাঙাচোরা ঘর, সামনে হাঁটাচলা করছে কিছু হাঁস-মুরগি। কিন্তু এরই মধ্যে টের পেয়ে যাবেন আপনি পৌঁছে গেছেন রামনিকু শহরে, যখন দেখবেন মার্সিডিজ গাড়ির ডিলারের দোকান। এই দোকানও খোলা হয়েছে ঘাসময় মাঠের মাঝখানে। কাচের দেয়ালের পেছনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে সারি সারি চকচকে সেডান গাড়ি। এরপরই রয়েছে আরো বিলাসবহুল গাড়ির দোকান। এসব দোকানে বিক্রি হয় ইউরোপের সেরা মানের সব গাড়ি। ইস্পাত আর কাচের দেয়ালে তৈরি এসব গাড়ির দোকান দেখলে মনে হয় যেনো সম্পদের চকমকে জাদু।

আসলে রামনিকু ভেলসিয়ার পথে চলে দামী দামী সব গাড়ির মধ্যে আছে টপ অব দ্য লাইন বিএমডব্লিউ, অডিস এবং মার্সিডিজ। আর এগুলো চালাচ্ছে বিশোর্ধ ও ত্রিশোর্ধ কিছু ভাগ্যবান মানুষ। আপনি যদি আপনার গাড়িচালককে জিজ্ঞেস করেন, এরা কি খুব মোটা বেতনে চাকরি করেন? তখন সে মৃদু হাসবে। আর ড্রাইভার তখন তার হাত দুটি শূন্যে তুলে হাতের তালু নিচের দিকে রেখে আঙুলগুলো বাঁকা করে টাইপ করার ভঙ্গি করবে আর বলবে– 'এরা ইন্টারনেট থেকে টাকা চুরি করে'।

বিশ্বব্যাপী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তাদের মধ্যে রামনিকু ভেলসিয়া শহরের একটা নাম প্রচলিত আছে। এরা এই শহরের নাম দিয়েছেন 'হ্যাকারভিলি'। সোজা কথায় হ্যাকারদের বাসস্থান। এটিও শব্দের এক ধরনের অপপ্রয়োগ। কারণ, এসব বড় প্রতারকের খুব অংশই প্রকৃতপক্ষে হ্যাকার। অবশ্য এ শহর পরিপূর্ণ অনলাইন ক্রোক দিয়ে। অনলাইন ক্রোক বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝি, যারা অনলাইনের মাধ্যমে অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে জীবনযাপন করে। এদের মধ্যে আছে সামান্য আয়ের প্রতারক থেকে শুরু

করে বিপুল আয়ের প্রতারকও। এরা বিশেষত অভিজ্ঞ বাণিজ্যিক অর্থ কেলেঙ্কারিতে। তা ছাড়া এরা পটু সেই সব ব্যাংকে ম্যালওয়্যার অ্যাটাকে, যেগুলো আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ লেনদেন করে। এ ধরনের ম্যালওয়্যার অ্যাটাকের মাধ্যমে এরা অনলাইনে অর্থ এদিক-ওদিক করায় পাকা ওস্তাদ।

আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণকারী একটি সংস্থার দেয়া অভিমতে এরা সাইবার অপরাধের মাধ্যমে বিগত কয়েক দশকে শত শত কোটি ডলার নিয়ে গেছে রামনিকু ভেলসিয়াতে। আর এ টাকা দিয়েই সেখানে গড়ে উঠেছে ও উঠছে নতুন নতুন অ্যাপার্টমেন্ট, নাইট ক্লাব আর শপিং সেন্টার। রামনিকু ভেলসিয়া হচ্ছে সেই শহর, যার প্রধান রফতানি পণ্য হচ্ছে 'সাইবারক্রাইম'। আর তাদের এ বাণিজ্য ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে।

বোগডান স্টইকার বয়স এখন ৩২। আর আলেকজান্ড্রু ফ্লানজার ২৯। এরা দুজন বড় হয়েছেন রামনিকু ভেলসিয়ায়। এরা ভেলসিয়ার সেই চারজন পুলিশের মধ্যে ২ জন, যারা কাজ করছেন এইসব অনলাইন জোচ্চোরদের খুঁজে বের করতে। স্টইকা বললেন, এক সময় রাস্তার ওপর যেসব গাড়ি দেখা যেত সেগুলো ছিল শুধু 'ডেসিয়া'র তৈরি। ডেসিয়া হচ্ছে রুমানিয়ার প্রাচীন গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি। শুধু কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা ভলবো কিংবা অন্যান্য মতো আমদানি করা গাড়ি ব্যবহার করতে পারত। এগুলো কিনে আনা হতো সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে। স্টইকা আরো বলেন, তখন তথ্যে প্রবেশের সুযোগ ছিল সীমিত। সাপ্তাহিক টেলিভিশনে থাকত দুই ঘণ্টার রাষ্ট্র পরিচালিত অনুষ্ঠান। প্রধানত এ অনুষ্ঠানে প্রচার চলত স্বৈরশাসক চচেস্কুকে নিয়ে। রোববারে আধাঘণ্টা দেখানো হতো কার্টুনচিত্র।

১৯৮৯ সালে কমিউনিস্টবিরোধী যে বিপ্লবের সূচনা হয়, তার শুরু হয় দাঙ্গার মধ্য দিয়ে। আর শেষ হয় চচেস্কু ও তার স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাধ্যমে। এরপর দেশে চালু হয় মুক্তবাজার অর্থনীতি। ১৯৯৮ সালে স্টইকা হাইস্কুলের পড়া শেষ করে চলে যান বুখারেস্টের পুলিশ অ্যাকাডেমিতে। তখন শুরু হয় আরেক বিপ্লব। সে বিপ্লবের নাম ইন্টারনেট বিপ্লব। অর্থনীতি আর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নেই। কিন্তু দেশ তখনো গরিব। রামনিকু ভেলসিয়া শহরের অবস্থা ছিল রুমানিয়ার আর সব শহরের চেয়ে অনেকটা ভালো। শহরটিতে ছিল কয়েক দশকের পুরনো একটি রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন কোম্পানির সদর দফতর। আশপাশে মনোরম পাহাড়, ঐতিহাসিক গির্জা ও সপ্তদশ শতাব্দীর মঠ থাকার ফলে এখানে গড়ে উঠেছিল ভালো পর্যটন শিল্প। তার পরও এ শহরের অনেক নাগরিকের জন্যই জীবনযাপন ছিল বেশ কঠিন। অনেক যুবক-যুবতীর জন্য কাজ পাওয়া সহজ ছিল না।

দেশটিতে যখন ইন্টারনেটে যোগাযোগ চালু হলো, সেখানকার মানুষ অনলাইনে জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ চুরি করার একটা উপায় হাতে পেল। রামনিকু ভেলসিয়ায় এ জালিয়াতি ব্যবসায়ে কয়েকজন পাইওনিয়ার হয়ে উঠল। সাইবারক্যাফের মাধ্যমে এরা সহজে ও সস্তায় নাম-পরিচয় না জানিয়ে ইন্টারনেটে ঢুকে অর্থ চুরি করতে শুরু করার সুযোগ পেল। রামনিকু ভেলসিয়ার অনলাইন জালিয়াতেরা এ কাজে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ওঠে। এরা ভুয়া বিজ্ঞাপন ছাপতে শুরু করে Craigslist, Auto Trader, eBay ইত্যাদির মতো বিভিন্ন সাইটে। এসব প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এরা ইন্টারনেটে ►

টাকা কামাতে শুরু করে। এ ধরনের জালিয়াতির জন্য এ শহরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে শুরু হয় ২০০২ সালের দিকে।

প্রথমদিকে সন্দেহভাজন জালিয়াতেরা ততটা তুখোড় ছিল না। প্রথম ঘটনায় একজন বিজ্ঞাপন ছাপে মোবাইল ফোনের। দেখা গেল তার পাওনা অর্থ অন্য কেউ নিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে ঘটনার শিকার তিনজনের কাছ থেকে এরা হাতিয়ে নিয়েছে ২০০০ ডলার। কিন্তু এরা এ টাকা জালিয়াতি করতে ভুয়া আইডি ব্যবহার করে। অতএব এরা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। অনেক জালিয়াত নিরাপদে এভাবে অনলাইনে টাকা চুরি করছে। খুব শিগগিরই রামনিকুর কয়েকজন তরুণের অনলাইন জালিয়াতি নিয়ে বেশ হইচই শোনা যায়। কিন্তু তাতেও থামানো যায়নি এই অনলাইন জালিয়াতি। যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারনেট প্রতারকদের শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে দ্রুত বেড়ে যেতে শুরু করে। সরকারিভাবে যেসব অভিযোগ পাওয়া যায়, তা প্রকৃত অভিযোগের সংখ্যা থেকে অনেক কম। তারপরও দেখা গেছে, ২০০২ সালে যেখানে এ ধরনের অভিযোগের সংখ্যা ছিল ৭৫ হাজার, সেখানে ২০০৯ সালে সে সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ লাখ ৩৭ হাজারে। আর এ ধরনের জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ এদিক-ওদিক করা হয় সর্বমোট ৫৬ কোটি ডলার। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআইয়ের লোকেরা যুক্তরাষ্ট্রে ও বুখারেস্টে তদন্ত চালিয়ে দেখেছে, এই অনলাইন অর্থ চুরির জন্য রামনিকু ভেলসিয়া একটি হাবে তথা চক্রকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ২০০৫ সালে অনলাইন জালিয়াতির মাধ্যমে এই শহরে এসেছে ১ কোটি ডলার।

এসব অনলাইন প্রতারকদের পিছু নিয়েছে নানা বাহিনী। কিন্তু তার মাঝেও জালিয়াতেরা নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে। প্রথম দিকে এরা প্রতারণার শিকার ব্যক্তিদের বলত অর্থ বিক্রেতাদের কাছে সরাসরি অর্থ না পাঠিয়ে এসক্রো সার্ভিসের মাধ্যমে পাঠাতে। এই এসক্রো সার্ভিস এমন এক থার্ড পার্টি, যার রয়েছে একটি ভুয়া ওয়েবসাইট, যার সাথে মিল রয়েছে একটি প্রতিষ্ঠিত কোম্পানির। এরা নানা ধরনের যেসব গল্প ফেঁদে ঘটনার শিকারদের ফাঁদে আটকাত তার কায়দা-কানুন এই কয় বছরে অনেক উন্নত হয়েছে। যেমন এরা মানুষকে প্রলুব্ধ করার জন্য অবিশ্বাস্য কম দামে পুরনো গাড়ি বিক্রির প্রস্তাব দিত। উদাহরণ টেনে বলা যায়, এরা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে জানাল, ইউরোপে কর্মরত একজন মার্কিন সেনা কর্মকর্তা বদলি হয়ে চলে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রে। সে জন্য তাকে শর্ট নোটিসে তার দামী গাড়িটি বিক্রি করতে হচ্ছে অবিশ্বাস্য ধরনের কম দামে। আরো বলা হলো, কোনো আগ্রহী ক্রেতা যদি কেনার আগেই গাড়িটি দেখতে চান, তবে শুধু জাহাজ ভাড়া দিলেই গাড়িটি তার কাছে পাঠিয়ে তাকে দেখানো যেতে পারে। এজন্য এর আগে তাকে গাড়ির দামও পরিশোধ করতে হবে না।

সময়ের সাথে জালিয়াতেরা তাদের কৌশল পাল্টে আরো উন্নত করেছে। স্থানীয় ইংরেজি ভাষাভাষীদের ভাড়া করে এনে এরা যুক্তরাষ্ট্রের লোকদের টার্গেট করে ই-মেইলের খসড়া তৈরি করিয়ে নিয়েছে। এ সময় উদ্ভব ঘটেছে নানা ধরনের বিশেষজ্ঞের। ভুয়া ওয়েবসাইট ডিজাইনার খুঁজে পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে যথাযথ ফোনকর্মী।

২০০৫ সালের দিকে এসে 'রুমানিয়া' শব্দটি অনলাইন কমার্স জগতে হয়ে ওঠে এক 'ডার্টি ওয়ার্ড'। আমাদের ভাষায় 'নোংরা শব্দ'। এরপর থেকে ক্রেতা-বিক্রেতারা ভেলসিয়া ও অন্যান্য রুমানীয় শহরে অনলাইনে অর্থ পাঠানোর ব্যাপারে সতর্ক হয়ে ওঠে। চোরেরা আবার পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়। এরা ভিন্ন পথ ধরে। এরা এদের দুষ্কর্মের সহযোগীদের কাছে অর্থ পাঠাতে বলে ইউরোপীয় কোনো দেশে। আর এর মাধ্যমে এরা এদের জালিয়াতির খেলার মাঠ আরো সম্প্রসারিত করে তোলে। তাদের জালিয়াতির এই ক্ষুদ্রশিল্প রূপ নেয় আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত অপরাধকর্মে। রামনিকু ভেলসিয়ার ক্রুকেরা সংযোগ গড়ে তুলতে শুরু করল একটি 'গ্লোবাল নেটওয়ার্ক অব কনফেডারেটস'-এর সাথে। এই নেটওয়ার্কের লোকেরা কাজ করে কুরিয়ার হিসেবে, আর অবাধে চালায় মুদ্রা পাচারের কাজ। অনলাইনে সরাসরি জালিয়াতদের কাছে পাঠানো হয় সে মুদ্রা- মাঝখানে কেটে রাখা হয় কমিশন।

ভেলসিয়ার লোকেরা অনলাইনে অর্থ জালিয়াতির ব্যাপারে বলাবলি করে খোলামেলাভাবে। আর এভাবেই এরা একজন আরেকজনের কাছ থেকে এ ব্যাপারে জেনে যায়। স্কুলপড়ুয়া এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে- 'হে, তুমি কি কিছু টাকা কামাতে চাও? আমি তোমাকে একটি অ্যারো হিসেবে ব্যবহার করতে চাই।' ব্যস, তখনই এই 'অ্যারো' শিখতে শুরু করে কী করে অনলাইনে টাকা চুরি করতে হয়।

মাইকেল মেকি। তিনি কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি গবেষণা করেন সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নিয়ে। তিনি বলেন, রামনিকু ভেলসিয়া গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ সাইবারক্রাইম নগরী হিসেবে, যেভাবে নিউইয়র্কের ফ্যাশন ডিস্ট্রিক্টগুলো গড়ে ওঠে বিশেষ কোনো শিল্পকেন্দ্র হিসেবে।

রামনিকু ভেলসিয়ায় নতুন নতুন ভবন গড়ে ওঠার পাশাপাশি আরেকটি কাজ লক্ষণীয়ভাবে চলছে। আর সেটি হচ্ছে, নতুন নতুন মানি ট্রান্সফার অফিস সৃষ্টি। এই শহরে ১ লাখ মানুষের বাস। কিন্তু এই শহরের কেন্দ্রস্থলে চারটি ব্লকে কম করে হলেও ২ ডজনেরও বেশি ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের স্টোর ফ্রন্ট। আর এগুলোর মাধ্যমেই সেখানে চলে মানিমেকিং গেম।

বিগত কয় দশক ধরে স্টইকা আর ফ্রানজা তাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের পিছু নিয়েছেন। এরা সামাজিক পরিস্থিতির মাঝে থেকে চেষ্টা চালিয়েছেন অপরাধীদের পাকড়াও করার জন্য। ফ্রানজাকে এজন্য খেলতে হয়েছে সেই ফুটবল টিমে, যে টিমে খেলেছে একজন সন্দেহভাজন। স্টইকা ও ফ্রানজা উভয়ের অভিযোগ, এরা এমন এক অপরাধের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছেন, যা কোনো সময়ই থামানোর মতো নয়। আর এরা এই অপরাধের বিরুদ্ধে লড়ছেন সীমিত সম্পদ নিয়ে। তারপরও এরা পুরোপুরি ব্যর্থ এমনটি বলা যাবে না। আসলে ২০০৮ সালে এরা প্রথম প্রকাশ করেন রামনিকু ভেলসিয়ার জালিয়াত নেটওয়ার্কের কথা। রেমিও চিতা নামের এক তরুণ উদ্যোক্তার ওপর স্টইকার তদন্তসূত্রে এ জালিয়াত চক্রের কথা জানা যায়।

রেমিও চিতা এ কাজ শুরু করেন যুক্তরাজ্যে একজন অ্যারো হিসেবে। সেখানে তার এ কাজ চলে সাফল্যের সাথে। অল্পদিনেই চিতা অবস্থানের উন্নয়ন ঘটান। সেই সাথে বন্ধুদের ভাড়া করে গড়ে তোলেন নিজস্ব ফ্রড রিং তথা প্রতারণা চক্র। ২০০৫ সালে রুমানীয় কর্তৃপক্ষ তার পিছু নেয়। স্টইকা বলেন, তখন দেখা গেল চিতা কয় মাস পরপর একটি করে নতুন গাড়ি কিনছেন, কিন্তু তার কোনো দৃশ্যমান আয় ছিল না। পরের বছর চিতা চালু করেন 'নেটওয়ান' নামের একটি ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার প্রতিষ্ঠান। আসলে এটি একদিকে মুদ্রা পাচার করত, অপরদিকে তার অনলাইন প্রতারণার কাজটি আড়ালে চলত একই সাথে।

এরই মধ্যে গ্রুপটি রামনিকু ভেলসিয়ার অন্য আর দশটা সাধারণ জালিয়াত চক্রের চেয়ে আলাদা হয়ে উঠেছে। এরা ভুয়া ই-মেইল পাঠিয়ে আমেরিকান কোম্পানিগুলো থেকে কৌশলে কোম্পানিগুলোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ও পাসওয়ার্ড হাতিয়ে নিত। অভিযোগ আছে, এরা লাসভেগাসের ঠিকানাহীন মানুষদের ভাড়া করে ভুয়া করপোরেট অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা চুরি খুলে টাকা চুরি করত।

রুমানীয় কর্তৃপক্ষ ও এফবিআই এজেন্ট আটলান্টিকের উভয় তীরে হানা দেয় জালিয়াতদের ধরার জন্য। রেমিও চিতা এখন সাময়িকভাবে কারাগারের বাইরে। এর আগে তাকে ১৪ মাস কারাগারে থাকতে হয়েছে। তার বিচারকাজ এখন স্থগিত আছে। সে এখন মুক্ত। তবে তার ছবি এখনো স্টইকার অফিস ফাইলে সবার ওপরে রয়েছে।

বলা হচ্ছে, চিতা ইংরেজি জানে না। এমনকি তার একটি ই-মেইল অ্যাড্রেসও নেই। সে কী করে ইন্টারনেটে জালিয়াতি করতে পারে। কিন্তু এরা নিজের পরিচয় গোপন রেখে সব কাজ করে অনলাইনে সেরে নেয়। ফলে এদের ধরা কঠিন। তারপরও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকেরা এদের ধরার চেষ্টা-সাধ্য অব্যাহত রেখেছে। এতে এরা কিছুটা সফলও হয়েছে। ২০১০ সালে রুমানিয়ায় ১৮০ জন অনলাইন ক্রুককে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু এটি হচ্ছে অন্তহীন এক কাজ। স্টইকা আর ফ্রানজা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন কাজটা কত কঠিন। চিরদিনের জন্য রামনিকু ভেলসিয়াকে অনলাইন জালিয়াতমুক্ত করা এখনো তাদের কাছে মনে হয় এক দুরাশা। তাই এরা এখনো জানেন না, কখন ভেলসিয়া মুক্ত হবে 'সাইবারক্রাইমের বিশ্বরাজধানী' নামের অপবাদ থেকে। আপনি আটক করবেন ২ জন, আর তাদের জায়গা এসে দখল করবে আরো ২০ জন। আমরা ২ জন পুলিশ কর্মকর্তা, আর এরা ২ হাজার।

তথ্যসূত্র : রিডার্স ডাইজেস্ট